দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ, বর্তমান বাস্তবতা ও নাগরিক উদ্বেগ

ড. বদিউল আলম মজুমদার, সম্পাদক এবং দিলীপ কুমার সরকার, সমন্বয়কারী, সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক (০৬ এপ্রিল, ২০১০)

"সরকারী কর্মচারীরা একটি আলাদা জাতি নয়। তারা আমাদের বাপ, আমাদের ভাই। তারা কোন different class নয়। ... আইনের চক্ষে সাড়ে সাত কোটি মানুষের যে অধিকার, সরকারী কর্মচারীদেরও সেই অধিকার। মজদুর, কৃষকদের টাকা দিয়ে সরকারী কর্মচারীদের মাইনে, খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করা হয়। সুতরাং, মজদুর, কৃষকদের যে অধিকার, সরকারী কর্মচারীদের সেই অধিকার থাকবে। এর বেশি অধিকার তাঁরা পেতে পারে না। সরকারী কর্মচারীদের মনোভাব পরিবর্তন করতে হবে যে, তাঁরা শাসক নন – তাঁরা সেবক।" – বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, গণপরিষদের শেষ অধিবেশনে প্রদত্ত ভাষণ, পরিষদ-বিতর্ক, ৪ নভেম্বর, ১৯৭২।

দুর্নীতি আজ আমাদের সমাজে একটি সর্বগ্রাসী ও সর্বব্যাপী সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুর্নীতি সমাজের সাধারণ মানুষদেরকে বঞ্চিত করছে – বস্তুত সমাজের উচুঁতলার মানুষদের ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে দুর্নীতি ক্ষুধার্ত ও দরিদ্র মানুষের পেটে লাথি মারার সমতূল্য। এ সমস্যা আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রাকেও ব্যাহত করছে। তাই দুর্নীতির বিরুদ্ধে সারদেশে বর্তমানে ব্যাপক জনমতও বিরাজ করছে। এ সমস্যা সমাধানের জন্য নীতি-নির্ধারকদের পক্ষে বারবার প্রতিশ্রুতিও ব্যক্ত করা হচ্ছে। তবুও জাতি হিসেবে এ ব্যাপারে আমরা যেন খুব একটা সামনে এগুতে পারছি না। বরং আমরা যেন আরও পেছনে পড়ে যাচ্ছি। বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য হলো সরকারের বর্তমান দুর্নীতি দমন কার্যক্রম পর্যালোচনা করা এবং এ ব্যাপারে আমাদের মতামত তুলে ধরা।

দুর্নীতি দমনে রাজনৈতিক অঙ্গিকার

দুর্নীতি নির্মুলের জন্য তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি: (১) যথাযথ আইনী কাঠামো, (২) কার্যকর প্রতিষ্ঠান, এবং (৩) সামাজিক প্রতিরোধ। আর এজন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক অঙ্গীকার।

গত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তার 'দিনবদলের সনদ' শীর্ষক নির্বাচনী ইশতেহারে 'দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা' গ্রহণকে অগ্রাধিকারের পাঁচটি বিষয়'-এর মধ্যে দ্বিতীয়–দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধের পরই গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করেছে। নির্বাচনী ইশতেহারে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে অঙ্গিকার করা হয়েছে: 'দুর্নীতি দমন কমিশনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে শক্তিশালী করা হবে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। ক্ষমতাধরদের বার্ষিক সম্পদের বিবরণ দিতে হবে। দুর্নীতি উচ্ছেদ, অনুপার্জিত আয়, ঋণখেলাপি, চাঁদাবাজি, টেণ্ডারবাজি, কালো টাকা ও পেশি শক্তি প্রতিরোধ নির্মুলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।' এছাড়াও ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এসব বিষয়ে, বিশেষত দুর্নীতি, চাঁদাবাজি, টেণ্ডারবাজি ও পেশিশক্তি নির্মুলে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা বারবার উচ্চারণ করে আসছেন।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল তার 'দেশ বাঁচাও-মানুষ বাঁচাও' শীর্ষক নির্বাচনী ইশতেহারে সুস্পষ্টভাবে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করে যে: "সমাজের সর্বস্তরে এবং সব শ্রেণীর মধ্যে দুর্নীতির প্রসার ঘটেছে। এ বিষয়ে দেশে ও বিদেশে ব্যাপক এবং অনেকক্ষেত্রে অতি প্রচারণা হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ সৎ ও নৈতিক জীবনযাপন করলেও বিশেষত বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এ অবস্থার পরিবর্তন আনতে হবে। সেই লক্ষ্যে-

- বিএনপি নির্বাচিত হলে দুর্নীতি দমন এবং দুর্নীতির উৎসগুলো রুদ্ধ করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা নেবে।
- রাষ্ট্রীয় এবং রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত সব প্রতিষ্ঠানের ক্রয়-বিক্রয় এবং কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের প্রয়াস অব্যাহত থাকবে। এসব ক্ষেত্রে যেকোন ধরণের অন্যায় প্রভাব বিস্তারের অপচেষ্টা নির্দয়ভাবে দমন করা হবে।
- বিগত বিএনপি আমলে প্রতিষ্ঠিত দুর্নীতি দমন কমিশনকে স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও কার্যকরভাবে দায়িত্ব পালনে সহায়তা করা হবে।
- সাধারণ মানুষের মধ্যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য ব্যাপক প্রচারণা কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে এবং এ ব্যাপারে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ, মিডিয়া ও জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা হবে।
- নির্বাচনের পর শপথ গ্রহণের ৩০ দিনের মধ্যে সকল নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে সম্পদের বিবরণী প্রকাশ করতে হবে। "

আওয়ামী লীগ ও বিএনপি আমাদের দেশের দু'টি প্রধান রাজনৈতিক দল। গত বিশ বছরে দল দু'টি দুই দুই বার রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছে। রাষ্ট্রের অধিকাংশ নাগরিক তাদের কর্মী-সমর্থক। তাদের নির্বাচনী ইশতেহারের দিকে তাকালে কারুরই সন্দেহ থাকার কথা নয় যে, দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধে আমাদের দেশে সুস্পষ্ট রাজনৈতিক অঙ্গিকার বিরাজমান। তবে দুর্ভাগ্যশত এ অঙ্গিকার মূলত কাগজে-কলমে। কি আওয়ামী লীগ, কি বিএনপি কোনো আমলেই দুর্নীতির বিরুদ্ধে তেমন কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি। বরং তাদের ছত্রছায়ায়ই দুর্নীতির ব্যাপক বিস্তার ঘটেছে এবং তা সর্বগ্রাসী রূপ নিয়েছে। তাই এটি বলা অত্যুক্তি হবে না যে, আমাদের দেশে দুর্নীতির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক অঙ্গিকারের কোনো কার্যকারিতা নেই।

বর্তমান বাস্তবতা

আইনী কাঠামো

দুর্নীতির বর্তমান বাস্তবতা নিরূপণ করতে হলে প্রথমেই আইনি কাঠামোর দিকে নজর দিতে হবে। অনেকদিন থেকেই দুর্নীতি দমনের লক্ষ্যে একটি আইনি কাঠামো বিরাজমান। তবে বিরাজমান কাঠামো দুর্নীতি দমনে কার্যকর নয়, এই অনুভূতির ভিত্তিতে গত চারদলীয় জোট সরকারের

আমলে 'দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪' প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত কমিশনের নিয়োগপ্রাপ্ত কমিশনারদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব এবং কমিশনের বিধিমালা প্রণয়ন ও জনবল কাঠামো নিয়ে জটিলতার কারণে প্রতিষ্ঠানটি সম্পূর্ণ অকার্যকর হয়ে পড়ে।

গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে এ সকল জটিলতার অবসান ঘটানো এবং কমিশনকে পুনর্গঠন করা হয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে দু'টি অধ্যাদেশের মাধ্যমে ২০০৪ সালের আইনে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী আনা হয়। একইসাথে কমিশনের জন্য একটি বিধিমালাও প্রণয়ন করা হয়। পুনর্গঠিত কমিশন দুর্নীতি বিরোধী অভিযানকে জোরদার করে এবং কয়েক শ' দুর্নীতির মামলা দায়ের করে। অভিযুক্তদের কারো কারো শাস্তিও হয়।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে আনীত সংশোধনীর মাধ্যমে কমিশনকে "একটি স্বাধীন, স্বশাসিত ও নিরপেক্ষ" প্রতিষ্ঠানে [ধারা ৩(২)] পরিণত করা হয় (স্বশাসিত শব্দটি যোগ করা হয়)। এছাড়াও এর মাধ্যমে কমিশনের আবশ্যক পূর্বানুমোদন ব্যতীত কমিশনের কর্মকর্তাদের ৭ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০০৭ পর্যন্ত গৃহীত কার্যাবলীর ভূতাপেক্ষ (ex post facto) অনুমোদনের বিধান করা হয় [ধারা ১৮(২)]। অর্থাৎ ২০০৭ এর ফেব্রুয়ারি মাসে কমিশনের সচিব কর্তৃক সম্পদের হিসাব চেয়ে প্রদত্ত সকল নোটিশের বৈধ্যতা এর মাধ্যমে প্রদান করা হয়। উপরন্তু এর মাধ্যমে কমিশনের কর্মকর্তাদেরকে এজহারের পূর্বেই অনুসন্ধানের প্রয়োজনে, কমিশনের পূর্বানুমোদনক্রমে, কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতারের বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হয় [ধারা ২১]। একইসাথে অধ্যাদেশের মাধ্যমে দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্তদের অপরাধসমূহকে আমলযোগ্য ও জামিন অযোগ্য করা হয় (ধারা ২৮ক)। আরো বিধান করা হয় যে, কমিশনের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোনো আদালত দুর্নীতি দমন আইনের অধীনে কোনো অপরাধ বিচারার্থে আমলে গ্রহণ করবে না [ধারা ৩২]। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০০১ এর অধীনের অপরাধসমূহও এর মাধ্যমে কমিশনের আওতায় আনা হয়।

বর্তমান সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে জারি করা অধ্যাদেশদ্বয়কে অনুমোদন করে নি। বরং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আইন সংশোধনের মাধ্যমে দুর্নীতি দমন কমিশনকে শক্তিশালী করার কথা সংসদে ঘোষণা দেন। পরবর্তীতে গত বছরের মাঝামাঝি কমিশনের আইন পর্যালোচনা ও সংশোধনের জন্য সুপারিশের লক্ষ্যে মন্ত্রী পরিষদের অধীনে একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করা হয়। যেহেতু কমিশনের নিজস্ব সম্পদের উৎস নেই, তাই কমিটি আইন থেকে 'স্বশাসিত' শব্দটি বাদ দেয়ার সুপারিশ করে। কমিটি সরকার কর্তৃক কমিশনের সচিব নিয়োগের সুপারিশও করে। এছাড়াও কমিশনকে রাষ্ট্রপতির নিকট জবাবদিহি করার পক্ষে কমিটি সুপারিশ করে।

পর্যালোচনা কমিটির সবচেয়ে বিতর্কিত সুপারিশটি হলো সরকারি কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা দায়েরের ক্ষেত্রে সরকারের পূর্ব অনুমোদন গ্রহণের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি। উল্লেখ্য যে, অতীতের এমনি একটি বিধান ২০০৪ সালের আইনের মাধ্যমে রহিত করা হয়। সম্পূর্ণ সরকারি কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠিত কমিটির এমন সুপারিশ সম্পূর্ণ বৈষম্যমূলক ও প্রজাতন্ত্রের কর্মচারিদের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট। সরল বিশ্বাসে অনৈতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়ে সরকারি কর্মকর্তারা দায়মুক্ত হতে পারলে, অন্যান্য নাগরিকদের বেলায়ও তা প্রযোজ্য হবে না কেন? বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেমন গণপরিষদের শেষ অধিবেশনে প্রদত্ত তাঁর ভাষণে বলেছেন, সরকারি কর্মকর্তারা ভিন্ন গোত্র নন এবং তাঁরা সাধারণ মানুষ থেকে বেশি অধিকার ভোগ করতে পারেন না।

কমিটির পক্ষ থেকে কমিশনকে রাষ্ট্রপতির কাছে জবাবদিহি করার সুপারিশের যৌক্তিকতা নিয়েও অনেকের মনে প্রশ্ন রয়েছে। আমাদের সংবিধানের ৪৮(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, "কেবল প্রধানমন্ত্রী ও ... প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত রাষ্ট্রপতি তাঁহার সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করিবেন"। তাই দুদক'কে রাষ্ট্রপতির কাছে দায়বদ্ধ করলে প্রতিষ্ঠানটি মূলত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বা নির্বাহি বিভাগের কাছে দায়বদ্ধ হয়ে যাবে এবং এর মাধ্যমে কমিশনের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হবে। তবে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানই দায়বদ্ধতার উর্ধ্বে নয়। আর দুদকের দায়বদ্ধতা যদি নিশ্চিত করতে হয়, তাহলে বিকল্প পদ্ধতির কথা ভাবা উচিত। এছাড়াও সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের মাধ্যমে দুদকের কমিশনারদেরকে অপসারণের বিধান আইনে এরই মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

কমিটির আরেকটি সুপারিশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যে বাধা অপসারণের লক্ষ্যে দুদকের পক্ষ থেকে ২০০৪ সালের আইনের ১৯(১) এ "আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন" শব্দগুলি সংযোজনে দুদকে'র পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয়। কমিটি এ প্রস্তাবের বিপক্ষে সুপারিশ করে। আমরা মনে করি যে, দুর্নীতি দমন কার্যক্রমকে সত্যিকারার্থে জোরদার ও ফলপ্রসূ করতে হলে দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের বিধানাবলীকে অন্যান্য আইনের ওপর প্রাধান্য দেয়া যুক্তিযুক্ত হবে বলে আমরা মনে করি।

প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যক্রমকে বেগবান করতে হলে কমিশনকে স্বাধীন ও শক্তিশালী করা জরুরি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত অনেক নাগরিকেরই ধারণা যে, সরকারের কার্যক্রম ও বক্তব্য এক্ষেত্রে সহায়ক নয়। যেমন, আওয়ামী লীগের দিনবদলের সনদে দুদককে শক্তিশালী করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত এবং দুর্নীতি দমনকে সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার বলে প্রধানমন্ত্রীর বার বার ঘোষণা সত্ত্বেও, সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের পর দুদকের সাবেক চেয়ারম্যান জনাব হাসান মশহুদ চৌধুরীকে পদত্যাগ করতে হয়। এছাড়া সরকারি প্রতিষ্ঠান-সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটি যখন দুদক কমিশনারদের কমিটির সামনে তলব করার মাধ্যমে হয়রানি করছিল এবং তাঁদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করাসহ বিভিন্ন হুমকি দিচ্ছিল, তখন সরকারের পক্ষ থেকে কিছুই বলা হয়নি। মাননীয় স্পিকারও এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরবতা পালন করেন, যা ছিল অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। এছাড়াও দুদকের আর্থিক স্বাধীনতা ও জনবলের অভাবের সমস্যাও রয়েছে। সরকারের সহযোগিতার

অভাবও দুদকের জন্য সংকট সৃষ্টি করছে। বর্তমান চেয়ারম্যান দুদকের বর্তমান করুণ অবস্থাকে বর্ণনা করতে গিয়ে এটিকে নখ ও দন্তহীন বাঘের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

আইন মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে মামলা প্রত্যাহার, বিশেষত দুর্নীতি মামলা প্রত্যাহারের সুপারিশও সরকারের দুর্নীতি বিরোধী কার্যক্রমকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। রাজনৈতিক হয়রানির অজুহাতে সরকার এ পর্যন্ত ৪ সহস্রাধিক মামলা প্রত্যাহারের সুপারিশ করেছে। এগুলোর মধ্যে কয়েক শ' দুর্নীতির মামলা রয়েছে। মামলা যদি সত্যিকার অর্থে হয়রানিমূলক হয়, তাহলে বিচার প্রক্রিয়ায়ই অভিযুক্তরা নির্দোষ বলে প্রমাণিত হবেন। তাই দুর্নীতির মামলা প্রত্যাহারের সুপারিশ কোনোভাবেই সরকারের দুর্নীতি বিরোধী কার্যক্রমকে জোরদার করার সাক্ষ্য বহন করে না। তবে আমরা আনন্দিত যে, দুদক মামলা প্রত্যাহারের ব্যাপারে সরকারের চাপের কাছে নতি স্বীকার করে নি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সরকারি দলের নেতাদের দুদক সম্পর্কে আক্রমণাত্মক বক্তব্যও দুর্নীতি দমনের কাজে সরকারের আন্তরিকতা সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করে। বলা হয় যে, গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে দুদক দুর্নীতির নামে রাজনীতি দমন করেছিল। শ্লোগান হিসেবে আকর্ষণীয় হলো, এটি একটি অর্থহীন বক্তব্য। রাজনীতি হলো রাষ্ট্র পরিচালনার লক্ষ্যে যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধতি। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক প্রক্রিয়া বা বিভিন্ন মত ও পথাবলম্বীদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা ও লেন-দেনের ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দুর্নীতির বা ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যক্তি বা কোটারি স্বার্থ রক্ষার অভিযোগে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের কিংবা তাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির মাধ্যমে কীভাবে রাজনীতি দমন হয়, তা আমাদের বোধগম্য নয়।

সংসদ ও সংসদীয় কমিটিগুলো সরকারের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার মাধ্যমে দুর্নীতি দমনে অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। দুর্ভাগ্যবশত, আমাদের বর্তমান সংসদ এবং কমিটিগুলো এ ব্যাপারে যথার্থ ভূমিকা রাখছে না। উদাহরণস্বরূপ, একটি বিশেষ সংসদীয় কমিটি সাবেক স্পিকার ব্যারিষ্টার জমির উদ্দিন সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অকাট্য প্রমাণ পেয়েছে বলে দাবি করলেও, এ মহান প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে। উল্লেখ্য যে, ভারতসহ অন্যান্য দেশে দুর্নীতিমূলক কার্যক্রমের অভিযোগে সংসদ সদস্যদের সংসদ থেকে বহিষ্কার করার বহু নজির রয়েছে।

মাননীয় সংসদ সদস্যদের নিজেদের অসদাচারণ ও দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপের আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো, মিথ্যা হলফনামার ভিত্তিতে সংসদ সদস্যের রাজউকের প্লট প্রাপ্তি। গণমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী সম্প্রতি ১৮ জন সংসদ সদস্য মিথ্যা হলফনামা দিয়ে উত্তরায় প্লট পেয়েছেন। মিথ্যা বলা অপরাধ, হলফ করে মিথ্যা বলা দণ্ডনীয় অপরাধ। যেমন, দণ্ডবিধির ধারা ২০০ অনুযায়ী, "যে ব্যক্তি, কোন ঘোষণা কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মিথ্যা বলিয়া জানিয়া অনুরূপ ঘোষণাকে সত্য হিসাবে দোষণীয়ভাবে ব্যবহার করে বা ব্যবহারের চেষ্টা করে, সেই ব্যক্তি এইরূপ দণ্ডিত হইবে যেন সে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিল।" দুর্ভাগ্যবশত, অসদাচারণের অভিযোগে সংসদ এ সকল সংসদ সদস্যের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

আরেকটি কারণেও দুর্নীতি দমনের ক্ষেত্রে সরকার ও সংসদের আন্তরিকতা নিয়ে প্রশ্নের উদ্রেক করে। পাবলিক একাউন্স বা সরকারি হিসাব সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটি সংসদের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কমিটিগুলোর অন্যতম। জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী-বিধি (ধারা ২৩৩) অনুযায়ী, এ কমিটির দায়িত্ব হলো: "সরকারের ব্যয় নির্বাহকল্পে সংসদ কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত অর্থের নির্দিষ্টকরণ সংবলিত হিসাব ... সরকারের বার্ষিক আর্থিক হিসাব পরীক্ষা করা এবং এই কমিটি সমীচীন মনে করিলে সংসদে উত্থাপিত অন্যান্য আর্থিক হিসাবও পরীক্ষা করিবেন।" সাধারণত, সৎ হিসেবে সুনাম সম্পন্ন এবং সহকর্মীদের আস্থাশীল একজন ব্যক্তিকে এ কমিটির সভাপতি করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত, ড. মহিউদ্দিন খান আলমগীরকে, যিনি দুর্নীতির মামলায় অভিযুক্ত এবং যে মামলা এখনো সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগে বিচারাধীন, তাঁকে সম্প্রতি এ গুরুত্বপূর্ণ কমিটির সভাপতি করা হয়। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, সরকারি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত সংসদীয় কমিটির সভাপতি হিসেবে তিনি এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে দুদকের চেয়ারম্যান ও কমিশনারদের হয়রানি করেছিলেন।

দুর্নীতি প্রতিরোধে আদালত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। আদালত যদি দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্তদের নিরপেক্ষভাবে বিচার এবং দোষীদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান না করেন, তাহলে দুর্নীতি উৎসাহিত হওয়াই স্বাভাবিক। পুনর্গঠনের পর দুর্নীতি দমন কমিশনের পক্ষ থেকে অনেকের, এমনকি অনেক ক্ষমতাধর ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। দুর্ভাগ্যবশত, প্রায় সবগুলি মামলাই উচ্চ আদালতে আটকে যায়। গণমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী ২০০৭-০৮ সালে ২০০৪ সালের আইনের আওতায় মোট ২০৩টি দুর্নীতির মামলা দায়ের করা হয়, যার ১২৯টি ঢাকায় এবং বাকিগুলো অন্যান্য জেলায়। এর অধিকাংশই অবৈধ সম্পদ অর্জন ও সম্পদের তথ্য গোপনসংক্রান্ত। এ সকল মামলায় অভিযুক্তরা বিচারের মুখোমুখি না হয়ে মামলা বাতিল ও স্থগিতের জন্য উচ্চ আদালতের স্মরণাপন্ন হন। ফলে দুদকের ওই ২০৩টি মামলা থেকে হাইকোর্টে মোট ১,০৯৯টি মামলার উৎপত্তি ঘটে। এর মধ্যে রিট ৬২৭টি ও ফৌজদারি বিবিধ মামলা ৪৭২টি। ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৬১ক ধারার আওতায় দুর্নীতির মামলায় অভিযুক্তদের অধিকাংশই সরাসরি তাঁদের মামলা বাতিলের আবেদন করেন। অধিকাংশ মামলায় প্রায় একই ধরনের গুরুত্বহীন টেকনিক্যাল গ্রাউণ্ড বা যান্ত্রিক আইনি প্রশ্ন তোলা হয়। ২০০৮ সালে শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াসহ প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা প্রায় ৪০০ মামলা স্থগিত করেন হাইকোর্ট (প্রথম আলো, ৫ এপ্রিল, ২০১০)

বর্তমানে উচ্চ আদালতে দুর্নীতির মামলার একটি গুরুতর জট সৃষ্টি হয়েছে। মূলত দু'টি মামলার কারণে এ জটের সৃষ্টি। এগুলো হলো সাবেক মন্ত্রী ও সংসদ সদস্য ড. মহিউদ্দিন খান আলমগীর এবং হাবিবুর রহমান মোল্লার দায়ের করা মামলা। দুর্নীতির মামলা নিয়ে হাইকোর্টের কার্যক্রম

দেখে অনেকের মনেই দুর্নীতি দমনের কার্যক্রমে উচ্চ আদালতের সহযোগিতার বিষয়ে প্রশ্নের সৃষ্টি হয়েছে। তবে হাবিবুর রহমান মোল্লার মামলায় আপীল বিভাগের ৪ এপ্রিল, ২০১০ তারিখের রায়ে আমরা আশাবাদী হয়ে উঠেছি। বিজ্ঞ বিচারকগণ হাবিবুর রহমান মোল্লার বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলাটি বৈধ বলে রায় দেন। এর ফলে যান্ত্রিক যুক্তির কারণে দুর্নীতির মামলা বাতিলের পথ রুদ্ধ হলো এবং আমরা আশা করি যে, জটে আটকে পড়া মামলাগুলো আবার সচল হবে।

দুর্নীতির ধরন পরিবর্তন ও বিস্তার

গত ১৭ নভেম্বর, ২০০৮ তারিখে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল কর্তৃক ঘোষিত দুর্নীতির ধারণাসূচক বা 'করাপশান পারসেপশন ইনডেক্স' অনুযায়ী দুর্নীতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থানে উন্নতি ঘটেছে – সরকারি খাতের দুর্নীতি কিছুটা কমেছে। সূচকের ০-১০ স্কেলে বাংলাদেশ ২.৪ স্কোর পেয়ে ১৮০টি দেশের তালিকায় নিম্নক্রম অনুযায়ী ত্রয়োদশ স্থানে উঠেছে। আগের বছর বাংলাদেশের স্কোর ছিল ২.১ এবং অবস্থান দশম। অর্থাৎ ১৮০টি দেশের মধ্যে গত বছরের তুলনায় বাংলাদেশের অবস্থান ১৪৭তম থেকে ১৩৯তম স্থানে উন্নীত হয়েছে। নিঃসন্দেহে এটি একটি ইতিবাচক সংবাদ। কিন্তু কতটুকু ইতিবাচক?

যে সব দেশের স্কোর ৩-এর কম, ধরে নেয়া হয় যে, সেসব দেশে দুর্নীতি ব্যাপক ও ভয়াবহ। এছাড়াও ২.১ এবং ২.৪ স্কোরের মধ্যে বিরাট পার্থক্য নেই। উপরন্তু বাংলাদেশের অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তনের পেছনে আরেকটি কারণ হলো অন্যান্য দেশে দুর্নীতির আরও ভয়াবহ বিস্তার। অর্থাৎ সাম্প্রতিক স্কোর থেকে বাংলাদেশে দুর্নীতি দূরীকরণের অগ্রগতি সম্পর্কে বেশি আশাবাদি হওয়া অযৌক্তিক হবে। প্রতিবেশীদের সাথে তুলনা করলেও এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট হওয়ার অবকাশ থাকে না। দুর্ভাগ্যবশত নেপাল ছাড়া দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের স্কোর বাংলাদেশের চেয়ে বেশি। যেমন, ভারতের স্কোর ৩.৪, মালদ্বীপের ২.৫, ভুটানের ৫.০, শ্রীলঙ্কার ৩.১ এবং নেপালের ২.৩। পাকিস্তান আর বাংলাদেশের স্কোর একই (২.৪)। অর্থাৎ সব প্রতিবেশীর তুলনায় আমরা ভালো করছি না।

ম্যাক্রো বা সামষ্টিক পর্যায়ে দুর্নীতির সূচকে কিছুটা ইতিবাচক পরিবর্তন হলেও, মাইক্রো বা ব্যাষ্টিক পর্যায়ে চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। অনেকের ধারণা যে, দুর্নীতি এখন আমাদের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে এবং তা নতুনভাবে প্রতিভাত হচ্ছে। এক সময়ে সমাজের উচ্চ স্তরের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা সকল সরকারি ক্রয়-বিক্রয় ও কন্ট্রাক্টের একটি অংশ উৎকোচ হিসেবে নিতেন। সে ঐতিহ্য এখনও বহুলাংশে বিরাজমান। বর্তমানে এর সাথে ফায়দাতন্ত্র যুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ এখন ক্ষমতাধররা আর কন্ট্রাক্ট থেকে তাঁদের অংশ নিয়ে শুধু সন্তুষ্ট নন, তাঁরা পুরো প্রকল্প বা কার্যক্রমকেই তাঁদের কর্মী-সমর্থক ও অনুগতদের জন্য ফায়দা হিসেবে ব্যবহার করছেন। যার ফলে বিভিন্ন কাজে অর্থ ব্যয় হলেও, সেগুলো সুচারুভাবে বাস্তবায়ন হয় না বা সেগুলো নিম্নমানের হয়। আর এ ফায়দা প্রদানের নীতির ফলে টেণ্ডারবাজি আজ ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করেছে। যেহেতু ক্ষমতাসীন দলের সাথে যুক্ত থাকলে অন্যায় করে পার পাওয়া যায়, তাই টেণ্ডারবাজির সাথে যুক্ত হয়েছে চাঁদাবাজি, দখলদারিত্ব ইত্যাদি। এগুলো আজ ব্যাপকভাবে, বিশেষত তৃণমূল পর্যায়ে বিস্তার লাভ করছে।

নাগরিক হিসেবে আমরা উদ্বিগ্ন

এটি সুস্পষ্ট যে, আমাদের দু'টি প্রধান রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ থেকে দুর্নীতি নির্মুলের ব্যাপারে বারবার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করলেও, এ সকল প্রতিশ্রুতির কোনো কার্যকর বাস্তব প্রতিফলন আমরা দেখতে পাই না। মহাজোট সরকার দুর্নীতি দমনের সুস্পষ্ট অঙ্গীকারের ভিত্তিতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেও, এ ব্যাপারে কোনো কার্যকর উদ্যোগ অদ্যাবধি গ্রহণ করে নি। কোনো দুর্নীতিবাজকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, এমনকি কোনোরকমের শাস্তিপ্রদানের পদক্ষেপ নেয়নি। বরং এ সংক্রান্ত সরকারের সকল কার্যক্রম বিপরীত ইঙ্গিতই বহন করে। সরকার দুদকের আইন পরিবর্তন করে প্রতিষ্ঠানটিকে দুর্বল ও অকার্যকর করার পাঁয়তারায় লিপ্ত। সংসদের পক্ষ থেকেও দুর্নীতি দূরীকরণে কোনো বলিষ্ঠ ও ফলপ্রসূ উদ্যোগ দেখা যায় না। বরং বাস্তবে তার উল্টো ঘটছে। উচ্চ আদালতের আচরণেও অনেকেই উদ্বিগ্ন, যদিও হাবিবুর রহমান মোল্লার মামলায় আপিল বিভাগের রায়ে আমরা কিছুটা আশান্বিত হয়েছি। বরং বাস্তবে তার উল্টো ঘটছে।

সবচেয়ে আশঙ্কার বিষয় যে, ক্ষমতাসীনদের পক্ষ থেকে ফায়দাতন্ত্রের চর্চার ফলে দুর্নীতির ধরণই এখন বদলে যাচ্ছে। ক্ষমতাধররা এখন আর কন্ট্রাক্ট এর একটি অংশ উৎকোচ হিসেবে নিয়েই সন্তুষ্ট নন, তাঁরা পুরো কার্যক্রমকেই তাদের কর্মী, সমর্থক ও আপনজনদের মধ্যে ফায়দা প্রদানের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে বদ্ধপরিকর। ফলে অনেক কার্যক্রমই যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয় না, যা আমাদের উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে চরমভাবে ব্যাহত করছে। একইসাথে ফায়দাতন্ত্রের অংশ হিসেবে তৃণমূল পর্যায়ে চাঁদাবাজি, টেণ্ডারবাজি, দখলদারিত্ব ইত্যাদি বিস্তারলাভ করছে। এই সকল গর্হিত কাজের পরিণাম সম্পর্কে নাগরিক হিসেবে আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। কারণ ফায়দাপ্রাপ্তির লোভে এবং ক্ষমতাসীন দলকে ছাতা হিসেবে ব্যবহারের সুযোগের ফলে অনেক অবাঞ্ছিত ব্যক্তিরাই সরকারি দলে এবং অঙ্গ-সহযোগী সংগঠনগুলোতে ভিড় জমাবে এবং সীমিত পরিমাণের ফায়দার জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হবে। যেহেতু ফায়দার পরিমাণ সীমিত, তাই এই প্রতিযোগিতা তীব্র হবে, এমনকি সহিংসতায় রূপ নিতে পারে। যা আমরা ইতিমধ্যেই লক্ষ করছি। পরিণতিতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটতে পারে এবং সরকারের নিয়ন্ত্রণ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে পারে। নাগরিক হিসেবে আমরা ভীষণ উদ্বিগ্ন।

আমরা আরো উদ্বিগ্ন যে, দুর্নীতি প্রতিরোধে তেমন কোনো কার্যকর নাগরিক উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয় না। যে দুই একটি সংগঠন বা ব্যক্তি এ ব্যাপারে প্রতিবাদী ও অনুঘটকের ভূমিকা পালন করছে, তারা আজ চরম চাপের মুখে। সরকার এই সকল কার্যক্রমকে উৎসাহিত না করে বরং সমালোচনাই করছে। তবুও একথা অনস্বীকার্য যে, সরকারের উদ্যোগের সাথে সাথে সামাজিক প্রতিরোধ ছাড়া দুর্নীতি নির্মুল করা অসম্ভব।